সাদাসিধে কথা

ছাত্ররাজনীতি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১৮ অক্টোবর, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ১২ মিনিটে

পিনট

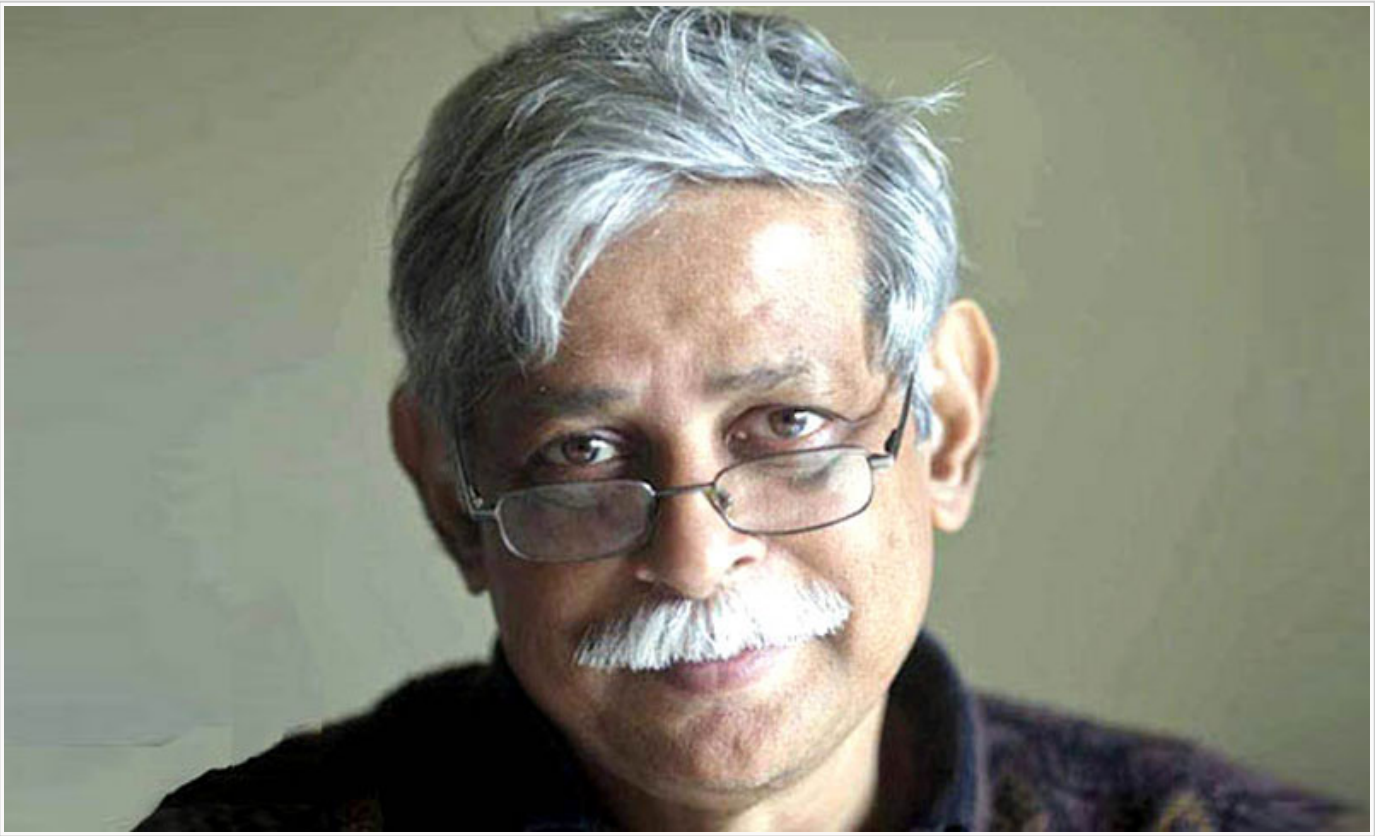

অ- অ অ+

আবরারের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি আমাদের সবাইকে একটা বিশাল ধাক্কা দিয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক রাগ-দুঃখ-হতাশা এবং ক্ষোভের পর্যায়টুকু শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখন তার পরের পর্যায়টুকু দেখতে পাচ্ছি, যেখানে এই অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনাটি নিয়ে দেশ-বিদেশে অল্পবিস্তর রাজনীতি করা শুরু হয়েছে। সরকারও তাদের মুখ রক্ষার কাজ শুরু করেছে। যদিও তাদের জন্য কাজটি খুব সহজ নয়। আমরা সবাই জানি, আবরারকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল; কিন্তু যেহেতু তাঁকে নির্যাতন করছিল ছাত্রলীগের নেতাকর্মী, তাই তারা দরকার হলে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও তাঁকে উদ্ধার করার সাহস পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমবয়সী কয়েকজন তরুণ ছাত্রের সামনে রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী শক্তিহীন, ক্ষমতাহীন ও অসহায় দুর্বল কিছু মানুষ,

তাদের চোখের সামনে অচিন্তনীয় নৃশংসতায় একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতে পারে; কিন্তু তারা কিছু করতে পারে না–এটি মেনে নেওয়া খুব কঠিন। বলা যেতে পারে, ছাত্ররাজনীতির সবচেয়ে ভয়াবহ রূপটি এবার আমরা দেখতে পেয়েছি।

খুব স্বাভাবিক কারণে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে সারা দেশে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, আমাদের দেশে এখন আসলেই ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সেটা নিয়ে সবাই কথা বলছে। 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররাজনীতি তুলে দেওয়া হয়েছে'–এই ঘোষণা দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কি না সেটা নিয়ে তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলেও শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে সে রকম আলোচনা হয়নি, যদিও সেটাও কম জরুরি একটা বিষয় নয়।

অনেক দিন পর আমি নিজেও আবার ছাত্ররাজনীতি নিয়ে ভাবছি, নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করছি, সত্যিই কী ব্যাপারটা এত সহজ? শুধু একটা ঘোষণা দিলেই রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? যখন বয়স কম ছিল তখন সব প্রশ্নের উত্তর জানতাম, আজকাল যেকোনো বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে দ্বিধা হয়। তবে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্রিয়ার মাঝে থাকার কারণে ছাত্ররাজনীতির নানা ধরনের ঘটনা দেখেছি, সে রকম কয়েকটি ঘটনার কথা বলি–তাহলে ছাত্ররাজনীতি কিভাবে কাজ করে হয়তো তার ধারণা পাওয়া যাবে!

ঘটনা : তখন বিএনপি-জামায়াত আমল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে। আমি ভর্তি কমিটির সভাপতি, সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার হলে ঢুকেছে, বাইরের সব মানুষকে বের করে বিল্ডিংগুলোর মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হলের বাইরে জনমানুষ নেই, ভেতরে মাত্র পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করে আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, এক ছাত্র তার পিঠে একটা ব্যাগ নিয়ে গদাই লস্করি চালে হলরুমের বারান্দা দিয়ে হাঁটছে। আমি ছাত্রটিকে চিনতে পারলাম, সে ছাত্রশিবিরের একজন নেতা। তার হাঁটার ভঙ্গিতে সবার জন্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটা মেসেজ। সেটি হচ্ছে : 'এই দেখ, পরীক্ষার হলে কারো ঢোকার কথা না; কিন্তু আমি শিবিরের নেতা, আমি ঢুকেছি এবং বুক ফুলিয়ে হাঁটছি। কারো সাধ্যি নাই আমাকে কিছু বলে।' আমি তার মেসেজকে থোড়াইপরোয়া করে হুংকার দিয়ে বললাম, 'এই ছেলে, তুমি এখানে কিভাবে ঢুকেছ? বের হও! এক্ষুনি বের হও।' আমি দারোয়ানকে ডেকে তাকে বের করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য ছাত্রশিবিরের কর্মী এসে আমাকে ঘিরে ফেলল, চিৎকার করতে লাগল, আমি নাকি তাদের সভাপতিকে অপমান করেছি! হৈচৈ শুনে তখন অন্য অনেকে ছুটে এসে কোনোভাবে অবস্থাটা সামলে নিলেন।

ঘটনার বিশ্লেষণ: এটি হচ্ছে ছাত্ররাজনীতি করার একটা অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন। শুধু অন্য ছাত্রদের সামনে নয়, শিক্ষক কিংবা প্রশাসনের সামনেও। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে কাজটি করার কথা কল্পনাও করতে পারবে না। ছাত্ররাজনীতি করা নেতা হলে তারা অবলীলায় সেটা করতে পারে–সবার মধ্যে এ রকম বিশ্বাস তৈরি করতে হয়।

ঘটনা : এটি কিছুদিন আগের একটি ঘটনা। ডিপার্টমেন্টের কোনো একটি উৎসবে সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছে, তাদের নিয়ে একটি সমাপনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে একজন প্রতিমন্ত্রীও আমার সঙ্গে মঞ্চে বসে আছেন। অনুষ্ঠান চলছে–তখন হঠাৎ করে স্লোগান শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি অডিটরিয়ামের পেছন থেকে সারি বেঁধে ১০-১২ জন ছাত্র আসছে। সবার সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি। তার পোশাক যথেষ্ট রাজকীয় এবং মুখে নেতাসুলভ গাম্ভীর্য। এই সভাপতিকেই অভিনন্দন জানিয়ে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। দৃশ্যটি যথেষ্ট হাস্যকর; কিন্তু স্লোগানের কারণে যিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন তাঁকে থেমে যেতে হলো এবং দলটি এসে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলোতে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল। তখন আবার অনুষ্ঠান শুরু হলো। বলাই বাহুল্য, ঘটনাটি যথেষ্ট দৃষ্টিকটু এবং আমি খুবই বিরক্ত হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের ছাত্রনেতা থাকে, সাধারণত আমি তাদের চিনি না। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সভাপতি আমার পরিচিত। কাজেই বক্তব্য দেওয়ার সময়

আমি তার নাম ধরে তাকে সবার সামনে তার এই ঔদ্ধত্যের জন্য বিতৃষ্ণাটুকু প্রকাশ করে সেটা জানিয়ে দিলাম। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমার থেকেও আরো অনেক কঠিন ভাষায় এই ছাত্রনেতাকে সতর্ক করে দিলেন।

ঘটনার বিশ্লেষণ : এটি ঠিক আগের ঘটনার মতোই, ছাত্রনেতারা বিশ্বাস করে যে কোনো অনুষ্ঠানের মাঝখানে স্লোগান দিতে দিতে ঢুকে যাওয়ার তাদের অধিকার আছে। শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসে যাওয়া তাদের জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতাবান, সেটা সবাইকে জানানোর জন্য তারা খুবই ব্যস্ত থাকে।

ঘটনা : তখন জামায়াত-বিএনপি আমল। পহেলা বৈশাখের দিন ছাত্র-শিক্ষক মিলে একটা আনন্দ শোভাযাত্রা করবে। তখন কয়েকজন ছাত্র আমাদের জানিয়ে দিল, ছাত্রদলের একজন নেতার হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী ধর্ষিতা হয়েছে। এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে তারা বিষয়টি প্রকাশ্যে এনে বিচার দাবি করার কাজটি শুরু করতে চায়। ছাত্রদলের নেতারা আশপাশেই আছে, কাজেই আমরাও যদি থাকি তারা হয়তো একটু নিরাপদ থাকবে। কাজেই আমরা শোভাযাত্রায় থাকলাম এবং একটি আনন্দ শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে একটি বিক্ষোভ শোভাযাত্রায় পাল্টে গেল। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রী বিশাল একটি প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলল। ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস ঘেরাও করে ধর্ষকদের বিচার করার দাবি করল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল উত্তেজনা, অসংখ্য ছেলে-মেয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস ঘেরাও করে বিচার দাবি করছে, দূরে ছাত্রদল এবং শিবিরের ছাত্ররা, কাছাকাছি একটা পুলিশের গাড়ি। হঠাৎ করে পুলিশের গাড়িটি ধীরে ধীরে সরে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ছাত্রদল এবং শিবিরের দলটি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আক্রমণ করল। যারা এ ধরনের আক্রমণ নিজের চোখে দেখেনি তাদের বিষয়টি বোঝানো খুব মুশকিল। ঘণ্টা দুয়েকের একটা ভয়ংকর তাণ্ডবের পর শেষ পর্যন্ত আবার পুলিশ ফিরে এলো এবং তখন ভাঙচুর ও তাণ্ডব থিতিয়ে এলো। ভেতরে আটকে থাকা ছাত্রীরা বের হতে পারল।

ঘটনার বিশ্লেষণ : আমার বিবেচনায় এই ঘটনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন ছাত্রনেতার হাতে ধর্ষিত হওয়ার পর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা খুব দক্ষতার সঙ্গে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কাজেই যারা দাবি করে নেতা গড়ে তোলার জন্য ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন, তাদের আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করার জন্য রাজনৈতিক দলের সদস্য হতেই হবে সেটি সত্য নয়। ছাত্ররাজনীতি না করেই একজন ছাত্র বা ছাত্রী কিভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করতে হয়, সেটা শিখতে পারে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু যে খুবই দক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে তা নয়, তারা খুব সতর্ক থেকেছে, যেন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের বিপদে পড়তে না হয় কিংবা আন্দোলনটা অন্যদিকে দিক হারিয়ে না ফেলে। শুধু তা-ই নয়, কেউ যেন ধর্ষিতা মেয়েটির পরিচয় জানতে না পারে, তারা সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করেছিল।

এ ঘটনার সময় আরো কয়েকটি বিষয় ঘটেছিল। ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাকর্মীরা যেন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নেতাকর্মীদের আক্রমণ করতে পারে, সে জন্য পুলিশ বাহিনী তাদের সাহায্য করেছিল। এটি আমাদের দেশের খুবই বেদনাদায়ক একটি ঘটনা। এ দেশের পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তারা শুধু সরকারের নয়, সরকারি দলের আজ্ঞাবহ অনুচর। আন্দোলনটি গড়ে তোলার সময় সভায় আমিও বক্তব্য দিয়েছিলাম। তার একটি ছবি দেখিয়ে একজন ছাত্র আমাকে বলেছিল, 'স্যার, আপনার ঠিক পেছনে যে ছাত্রটি দাঁড়িয়ে আছে, সে হচ্ছে ধর্ষকদের একজন সহযোগী।'

h

দুঃখের কথা হচ্ছে, ধর্ষককে শেষ পর্যন্ত কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। তবে যে বিষয়টি আমি কখনোই বুঝতে পারিনি সেটা হচ্ছে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন রাষ্ট্রের আইন কাজ করবে না? একটি ছাত্র পরীক্ষায় নকল করলে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু সে ধর্ষণ করলে কেন পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে না, বিচার করে আজীবন জেলে আটকে রাখবে না? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা কেমন করে দেশের আইনের ঊর্ধ্বে থাকে?

এই পুরো দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে একমাত্র স্বস্তির বিষয় হচ্ছে, ধর্ষিতা ছাত্রীটির পরিচয় কেউ জানতে পারেনি। সে তার লেখাপড়া শেষ করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পেরেছে।

ঘটনা : অনেক আগের ঘটনা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ফাইনাল পরীক্ষার একটা তারিখ ছিল, যদি কোনো কারণে একটি বিভাগও সেই তারিখে পরীক্ষা শুরু করতে না পারত, তাহলে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে যেত। ছাত্রনেতাদের লেখাপড়া নিয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই, যত দীর্ঘ সময় তারা ছাত্র হিসেবে থাকতে পারবে, ততই লাভ। তাই পরীক্ষা পেছানোর ব্যাপারে তারা খুবই আগ্রহী। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এ নিয়ে খুবই ত্যক্তবিরক্ত। একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পেছানোর পাঁয়তারা চলছে, তখন হঠাৎ করে হলের মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিল, যেভাবে হোক তারা পরীক্ষা দেবে! স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল উত্তেজনা; ভোরবেলা ছাত্রীরা দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে দল বেঁধে পরীক্ষা দিতে বের হয়ে এসেছে এবং ছাত্রনেতারা তাদের রাস্তা আটকে রেখে স্লোগান দিচ্ছে, ককটেল ফাটাচ্ছে। আমরা কয়েকজন শিক্ষক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি বাড়াবাড়ি কিছু না ঘটে যায় সেটি দেখার জন্য। চার-চারটি ঘণ্টা কেটে গেল, তখন ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রীদের অনুরোধ করলেন তাদের হলে ফিরে যাওয়ার জন্য। কথা দিলেন তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। তখন তখনই একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ এখন থেকে আলাদা আলাদাভাবে নিজের পরীক্ষা নিতে পারবে। এখন যেহেতু পরীক্ষা শুরুর নির্দিষ্ট একটি তারিখ নেই, ছাত্রনেতারা আর পরীক্ষা আটকাতে পারে না, সত্যি সত্যি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল!

ঘটনার বিশ্লেষণ : ছাত্ররাজনীতির বিভিন্ন দলের মাঝে সাপে-নেউলে সম্পর্ক, এক দল পারলে আরেক দলকে খুন করে ফেলে। কিন্তু লেখাপাড়া না করার মধ্যে কিংবা পরীক্ষা পেছানোর মাঝে তাদের ভেতরে কোনো বিরোধ নেই, তখন সবাই একসঙ্গে।

ঘটনা : তখন জামায়াত-বিএনপি আমল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের শ্বাসবন্ধ করা অবস্থা। তখন হঠাৎ মোটামুটি এক ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রক্টর ঘোষণা দিলেন, তাঁরা কেউ তাঁদের পদ ছাড়ছেন না; কিন্তু কাজ করা বন্ধ রাখবেন। প্রক্টরহীন বিশ্ববিদ্যালয় খুবই বিপজ্জনক জায়গা। ঠিক তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পাশের রাজীব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের কোনো একটা বিষয় নিয়ে গোলমাল লেগে গেল। দুই দলের ভেতর মারামারি, ঢিল ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। যেহেতু কোনো প্রক্টর নেই, তাদের থামানোরও কেউ নেই। তখন পুলিশ এসে গুলি করল; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র গুরুতর আহত হলো। সিলেটের ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ গুরুতর আহত ছাত্রদের ঢাকা পাঠিয়ে দিল এবং ভোর রাতে খবর এলো, আমাদের একজন ছাত্র মারা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদের একজন সহপাঠীর গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার মতো একটি খবর সহ্য করার মতো নয়। মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভে ফেটে পড়ল এবং ছাত্র-ছাত্রীরা ভাইস চ্যান্সেলরের ভবন আক্রমণ করল। তাদের সব ক্ষোভ তাঁর ওপর এবং কয়েক ঘণ্টা জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের পর ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর পদত্যাগপত্র লিখে দিলেন। দুটি ট্রাক এনে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর জিনিসপত্র তুলে বিদায় নিলেন। একজন ভাইস চ্যান্সেলরের জন্য সেটি যথেষ্ট অসম্মানজনক বিদায়।

h

ঘটনার বিশ্লেষণ : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের সহপাঠীর মৃত্যু খুব হৃদয়বিদারক ঘটনা। এ রকম একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে যদি বিশালসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী হঠাৎ করে সংগঠিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ছাত্ররাজনীতির দলগুলো সংগঠিত হলেও বিশালসংখ্যক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর সামনে তখন তারা অসহায়। তবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের অর্জনটুকু ধরে রাখা কঠিন। সবাই অপেক্ষা করে তাদের উত্তেজনা কমে আসার জন্য এবং উত্তেজনা কমে আসার পর আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার কয়েক মাস পর তিনি শিবির এবং ছাত্রদলের পাহারায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছিলেন।

২.

আমি যখন এই লেখাটি লিখছি তখন আমার ঘনিষ্ঠ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার ২৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ছাত্ররাজনীতির কারণে ভালো কিছু হয়েছে সে রকম কিছু কি দেখেছ?

আমার তখন গণজাগরণ মঞ্চের কথা মনে পড়ল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা তরুণদের সেই অবিশ্বাস্য আন্দোলনের সময় কিন্তু ছাত্রদের প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী সব কটি রাজনৈতিক দল সাহায্য করেছিল। শুধু তা-ই নয়, মে মাসের ২৯ তারিখ সন্ধ্যাবেলা আমি শাহবাগে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যখন হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর দিয়ে আক্রমণ করেছিল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের প্রতিহত করেছিল।

কাজেই আমরা কি জোর দিয়ে বলতে পারি এই দেশে ছাত্ররাজনীতির আর কোনো দরকার নেই। ভবিষ্যতেও কখনো দরকার হবে না?

লেখক : কথাসাহিত্যিক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মন্তব্য